~ বৈষ্ণব পদাবলী ~

বৈষ্ণব পদাবলি বা বৈষ্ণব পদাবলী বৈষ্ণব ধর্মতত্ত্বের রসভাষ্য নামে খ্যাত এক শ্রেণীর ধর্মসঙ্গীত সংগ্রহ। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যর সূচনা ঘটে চর্তুদশ শতকে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস-এর সময়ে তবে ষোড়শ শতকে এই সাহিত্যের বিকাশ হয়। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রধান অবলম্বন রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা।

বৈষ্ণব পদাবলীর তত্ত্ব

শ্রীকৃষ্ণ হলেন সৎ-চিৎ-আনন্দের মূর্তিমান বিগ্রহ।রাধা তাঁরই প্রকাশাত্মিকা শক্তি।শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী অংশ সঞ্জাত রাধা সৃষ্টি হয়েছেন তাঁরই লীলাসুখানুভবের জন্য।শ্রীরাধা আয়ান বধূ।তাই শ্রীকৃষ্ণের সাথে তাঁর প্রেম অসামাজিক, পরকীয়া।জীবও তেমনই তত্ত্বের দিক থেকে শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয় হলেও রূপ-রস-গন্ধযুক্ত জগতের সঙ্গে সে এমনই নিবিড়ভাবে আবদ্ধ যে সে তার স্বকীয়তা ভুলে যায়।সেই ভুল ভাঙলে জীব ভগবানের ডাকে সাড়া দেয়, তখন ঘটে তার পরকীয়া অভিসার।এভাবেই তৈরী হয়েছে বৈষ্ণব পদাবলীর তত্ত্ব।

বৈষ্ণব পদাবলী বিভিন্ন পর্যায়

■পূর্বরাগ

শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর "উজ্জ্বলনীলমণি"তে শৃঙ্গারকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। ক)বিপ্রলম্ভ ,খ) সম্ভোগ। আবার বিপ্রলম্ভকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন- পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিও, ও প্রবাস। শ্রীরূপ গোস্বামী পূর্বরাগের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন---

"রতির্যা সংগমাৎ পূর্বং দর্শনশ্রবণাদিজা।
তয়োরুন্মীলতি প্রাজ্ঞৈ পূর্বরাগ স উচ্যতে।।"

প্রকৃত মিলনের আগে নায়ক নায়িকার পারস্পরিক দর্শন প্রভৃতি থেকে জাত মিলনেচ্ছাময় রতি উপযুক্ত সঞ্চারীভাব ও অনুভাবের দ্বারা পুষ্ট হয়ে প্রকাশ পেলে তাকে পূর্বরাগ বলে।

পূর্বরাগ অবস্হার সঞ্চারীভাব হল ব্যাধি, শঙ্কা, অসূয়া, শ্রম, ক্লম বা ক্লান্তি, নির্বেদ, ঔৎসুক্য, দৈন্য, চিন্তা, নিদ্রা, জাগরণ, বিষাদ, জড়তা, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু।

কৃষ্ণবিষয়ক রতির সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থার বিভাগ অনুসারে পূর্বরাগের সাধারণ, সমঞ্জস ও প্রৌঢ় এই তিনটি ভাগ।এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রৌঢ়-পূর্বরাগের প্রধান দশটি সঞ্চারীভাব---লালসা, উদ্বেগ, জাগরণ, তানব, জড়িমা, বৈয়গ্র্য, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ এবং মৃতির (মৃত্যু বাসনা) মধ্য দিয়ে এই পূর্বরাগ "দশা" রূপ লাভ করে।

■ অনুরাগ

যে রাগ নিত্য নব রূপে সর্বদা অনুভূত প্রিয়জনকেও নতুনভাবে অনুভব করিয়ে প্রতি মুহূর্তেই প্রেমকে নবীনতা দান করে তাকেই অনুরাগ বলে।

শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর "উজ্জ্বল নীলমণি" গ্রন্থে অনুরাগের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন ---

"সদানুভূতমপি যঃ কুর্যান্নবনবং প্রিয়ম্।
রাগো ভবন্নবনবঃ সোহগনুরাগ ইতীর্যতে।।"

অনুরাগের ফলে প্রিয়স্বাদ বাসনার তৃপ্তি হয়না কখনো আর প্রীতিও পরিণতি পায়না। অনুরাগের লক্ষণ চারটি। ক)পরস্পরবশীভাব, খ) প্রেমবৈচিত্ত, গ) অপ্রাণীতেও জন্মলাভের উৎকট লালসা, ঘ) বিরহেও কৃষ্ণ অনুভব বা বিপ্রলম্ভে বিস্ফুর্তি।

■ অভিসার

অভিসার শব্দের অর্থ সংকেত স্হানে গমন। আগে উদ্দিষ্ট স্হানে যাওয়া বোঝাতে শব্দটি ব্যবহৃত হতো। ক্রমশ এটি প্রেমিক প্রেমিকার মিলনের উদ্দেশ্যে পরস্পরের অভিমুখে যাত্রাকেই বোঝাতে থাকে। "রসকল্পবল্লী"তে উদ্ধৃত অভিসারিকার সংজ্ঞা হল---**" কান্তার্থিনী তুখা যাতি সংকেতং অভিসারিকা।"** কান্তের উদ্দেশ্যে যিনি সংকেত স্থানে

গমন করেন, তিনিই অভিসারিকা। নারায়ণদাস রচিত গীতগোবিন্দের " সর্বাঙ্গসুন্দরী" টীকায় অভিসারিকার সংজ্ঞা হল--

"দুর্বার দারুণ মনোভাববহ্নিতপ্তা
পর্য্যাকুলাকুলিত-মানসমাবহন্তি।
নিঃশঙ্কিনী ব্রজতি যা প্রিয়সঙ্গমার্থং
সানায়িকা খলু ভবেদভিসারিকেতি।।"

দুর্বার দারুণ মদন-বহ্নিতে উওপ্তা, যে নায়িকা আকুল মনে নির্ভয়ে প্রিয়র সাথে মিলিত হওয়ার জন্য যাত্রা করেন তিনিই অভিসারিকা।

শ্রীরূপ গোস্বামীর "উজ্জ্বল নীলমণি"তে অভিসারিকার যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে-----

" যা ভি সারয়তে কান্তং স্বয়ং বা ভি সরত্যপি।
সা জ্যোৎস্নী তামসী যান যোগ্যবেশাভিসারিকা।।
লজ্জয়া স্বাঙ্গলীনের নিঃশব্দাখিলমন্ডনা।
কৃতাবগুণ্ঠা স্নিগ্ধৈক সখিযুক্তা প্রিয়ং ব্রজেৎ।।"

"রসকল্পবল্লী"তে অভিসারিকার সংকেত স্থান কি কি হতে পারে তারও উল্লেখ আছে। নিকুঞ্জকানন, উদ্যান, জলশূন্য পরিখা, অট্টালিকার গবাক্ষ, নদী তীরের কন্টকযুক্ত বাঁধ, গৃহের পিছন, ভাঙা মঠ মন্দিরকে অভিসারের সংকেত স্থান হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

পীতাম্বর দাস "রসমঞ্জরী"তে আট ধরনের অভিসারের কথা বলেছেন।

"সেই অভিসার হয় পুন আট প্রকার।
জ্যোৎস্নী, তামসী, বর্ষা, দিবা-অভিসার।।
কুজ্ঝটিকা, তীর্থযাত্রা, উন্মত্তা, সঞ্চরা।
গীত পদ্য রসশাস্ত্রে সর্ব্বজনোৎকরা।।"

আসলে অভিসারের এই সময় বৈচিত্র্যই বুঝিয়ে দেয় অভিসারের কোনও দিন-ক্ষণ নেই। প্রাণের আবেগ অসময়কেও সময় করে তোলে। বৈষ্ণব পদাবলীতেও শ্রেষ্ঠ অভিসার- বিষয়ক বেশিরভাগ পদই বর্ষণমুখর রাতে রাধার তিমিরাভিসারের বর্ণনা।

অভিসার পর্যায়ের বিশেষত্ব হল প্রকৃতি এখানে রাধাকৃষ্ণের প্রেমে বা রাধাকৃষ্ণের মিলনের পথে প্রতিকূল ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আর সেই প্রতিকূলতার কষ্টিপাথরে যাচাই হয়েছে রাধার 'নিকষিতহেম' তুল্য কৃষ্ণপ্রেম। এই রাধা বিঘ্নবিজয়িনী, অধ্যাত্মপথযাত্রিণী।

■ প্রেম বৈচিত্ত্য ও আক্ষেপানুরাগ

"প্রিয়স্য সন্নিকর্ষোহনপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে।।"

প্রেমোৎকর্ষহেতু প্রিয়তমের নিকটে অবস্থান করেও বিচ্ছেদের ভয় থেকে যে আর্তি তাকে প্রেমবৈচিত্ত্য বলে। বৈচিত্ত্য শব্দের অর্থ চিত্তের অন্যথা ভাব। গোপী প্রেমে বিশেষ করে মহাভাবময় রাধাপ্রেমে এই ভৃবের প্রকাশ বিশেষভাবে হয়ে থাকে।

দীনবন্ধু দাস তাঁর " সংকীর্তনামৃতে" প্রেমবৈচিত্তের যে আটটি বিভাগ করেছেন তা হল--- রূপানুরাগ, উল্লাস অনুরাগ, পাঁচ ধরনের আক্ষেপানুরাগ ও রসোদগার। পাঁচ ধরনের আক্ষেপানুরাগ হল কৃষ্ণের প্রতি, মুরলীর প্রতি, নিজের প্রতি, সখীগণের প্রতি, ও দূতির প্রতি আক্ষেপ।

আক্ষেপানুরাগে শ্রীমতি রাধার সর্বদা বিরহ অবস্থার প্রকাশ। প্রায় অকারণ বিরহ কাতরতা , কৃষ্ণ মথুরায় না গেলেও স্বল্পকালীন বিচ্ছেদের অসহনীয় অবস্থায় আক্ষেপই এই পর্যায়ের পদের বৈশিষ্ট। আক্ষেপানুরাগ প্রেমবৈচিত্ত্যেরই অংশ। প্রেমবৈচিত্ত্যে রাধাকৃষ্ণ ঘনিষ্ঠ মিলনের মধ্যেও বিরহ কাতরতা অনুভব করেন। আর আক্ষেপানুরাগে স্থায়ী দুঃখকাতরতা লক্ষ করা যায়। এই দুঃখ যেহেতু রাধার অনুভবের ব্যাপার তাই এর শেষও নেই। প্রকৃতপক্ষে আক্ষেপানুরাগের মধ্যেই

মহাভাবস্বরূপিণী রাধার সমাজ সংস্কার, নিজের অদৃষ্ট, কৃষ্ণের দেওয়া দুঃখ, এমনকি নিজের কাছ থেকে পাওয়া দুঃখের পূর্ণ পরিচয় লাভ করা যায়।

■ মাথুর

' মাথুর' বিরহ পর্যায়ের একটি অবস্থা। পূর্বে মিলিত যুবক যুবতীর কেউ যদি দেশান্তরে গমন করেন তখনই বিরহ সম্ভব হয়। এই অবস্থাকে বলে প্রবাস। 'উজ্জ্বল নীলমণি'তে শ্রীরূপ গোস্বামী বলেছেন---

পূর্বসঙ্গতয়োর্যূনোর্ভবেদ্দেশান্তরাদিভিঃ।
ব্যবধানস্তু যৎপ্রাজ্ঞৈঃ স প্রবাস ইতির্যতে।।

প্রবাস-বিপ্রলম্ভ নিকট প্রবাস ও দূর প্রবাস ভেদে দুরকমের। কালিয়দমনে, গোচারণে নন্দমোক্ষণে, কার্যানুরোধে, স্থানান্তরগমনে এবং রাসের অন্তর্ধানে--- এই পাঁচ প্রকার নিকট প্রবাস হয়।

দূর প্রবাস তিন প্রকার।-- ভাবী, ভবন্ ও ভূত বা মথুরা প্রবাস। ভাবী- বিরহে হঠাৎ বিরহ ঘনিয়ে আসছে বলে মনে হয়। যেমন একটি রথ এসেছে দেখে আশঙ্কা হয়, কৃষ্ণ বুঝি ওই রথে চড়ে চলে যাবেন। কৃষ্ণ চলে যাচ্ছেন এই অবস্থা হল ভবন বিরহ। কৃষ্ণ আসবেন কথা দিয়ে চলে গেছেন কিন্তু নির্দিষ্ট দিন উত্তীর্ণ হওয়ার পরও তিনি এলেন না। এই অবস্থা হল ভূত প্রবাস। এই অবস্থায় নায়িকার যে দশ দশা হয় শ্রীরূপ গোস্বামী তার বিভিন্ন নাম দিয়েছেন--- চিন্তা, জাগরণ, উদ্বেগ, তানব বা কৃশতা, মলিনাঙ্গতা, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ, মোহ ও মৃত্যু।

প্রবাসের আরও একরকম বিভাজন হয়।-- বুদ্ধি পূর্বক ও অবুদ্ধি পূর্বক।

বৈষ্ণব পদকর্তাগণ

বিদ্যাপতি:

বিদ্যাপতি পঞ্চদশ শতকের মৈথিল কবি | বঙ্গদেশে তাঁর প্রচলিত পদাবলীর ভাষা ব্রজবুলি |কথিত আছে যে পরমপুরুষ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিত্য তাঁর রচনা গাইতে ভালবাসতেন |অনেক বাঙালী কবি এই ভাষায় কবিতা রচণা করেছেন | রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভানুসিংহের পদাবলীতে' আমরা এই ভাষার ব্যবহার দেখতে পাই |বাঙালীরা চর্যাগীতির ভাষা থেকে এই ব্রজবুলীকে অনেক সহজে বুঝতে পারেন | এই কারণেই বিদ্যাপতিকে বাঙালী কবিদের অন্যতম হিসেবেই গণ্য করা হয় | তাঁর পদাবলী ছন্দ, আলংকারিক নৈপুণ্য ও গভীর হৃদয়াবেগে সমৃদ্ধ | প্রেম ও ভক্তি তাঁর কবিতায় প্রধান হয়ে উঠেছে |

কবি ও কাব্যপরিচয়

কবি বিদ্যাপতির জন্ম দ্বারভাঙা জেলার বিসফী গ্রামের এক বিদগ্ধ ব্রাহ্মণ পরিবারে। তার কৌলিক উপাধি ঠক্কুর বা ঠাকুর। বংশপরম্পরায় তারা মিথিলার উচ্চ রাজকর্মচারী ছিলেন। শস্ত্র, শাস্ত্র, রাজ্যশাসন ও সংস্কৃতি সাহিত্যে তাদের দান বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। তিনি যে বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন ছয়জন রাজা ও একজন রানীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ থেকেই তার স্বীকৃতি মেলে। কবি স্মৃতিকার রাজনীতিবিদ ব্যবহারবিদ ও আখ্যান লেখক হিসেবে তিনি সুপরিচিতি। তার রচনাবলির মধ্যে রয়েছে কীর্তিলতা ভূপরিক্রমা, কীর্তিপতাকা, পুরুষ পরীক্ষা, শৈবসর্বস্বসার, গঙ্গাবাক্যাবলি, বিভাগসার, দানবাক্যাবলি, লিখনাবলি, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী। তিনি প্রায় আট শ’ পদ রচনা করেন। জীবৎকালে বিখ্যাত কবি ও পণ্ডিতরূপে তার প্রতিষ্ঠা ছিল।

মিথিলার কবি হলেও অমর পদাবলি অচিরেই সমগ্র বাংলাদেশে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। মিথিলার উপভাষা ব্রজবুলিই তাঁর পদাবলির বাহন। এই ভাষার ধ্বনি-মাধুর্য ও সঙ্গীতময়তা বাংলা কাব্যকে, বিশেষ করে বৈষ্ণব পদাবলিকে সমৃদ্ধ করেছে। বিষয়ের লালনে, ধ্বনি, শব্দ, অলঙ্কার প্রভৃতির ব্যবহারে তার নাগরিক বৈদগ্ধ ও মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি চৈতন্য-পূর্ববর্তী কবি। তাই তার রাধা মানবীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। রাধার বয়:সন্ধির দৈহিক সুষমা ও লাস্যময়তা তার পদাবলিকে ঐশ্বর্যময় করেছে। ভাব-সম্মিলন ও ভাবোল্লাসের পদেও বিদ্যাপতি এক প্রকার প্রতিদ্বন্দ্বিহীন। তার ভাব সম্মিলনের একটি পদ এখানে সঙ্কলিত হয়েছে।

কবি বিদ্যাপতি ‘মৈথিল কোকিল’ ও অভিনব জয়দেব নামেখ্যাত এই বিস্ময়কর প্রতিভাশালী কবি একাধারে কবি,

শিক্ষক, কাহিনীকার, ঐতিহাসিক, ভূবৃত্তান্ত লেখক ও নিবন্ধকার হিসেবে ধর্মকর্মের ব্যবস্থাদাতা ও আইনের প্রামাণ্য গ্রন্থের লেখক ছিলেন।

ড. বিমানবিহারী মজুমদারের মতে, বিদ্যাপতি সম্ভবত ১৩৮০-১৪৬০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। সংস্কৃতে তার পাণ্ডিত্য ছিল, অপভ্রংশে তিনি কীর্তিলতা নামে ঐতিহাসিক কাব্য লিখেছিলেন, বিভিন্ন বিষয়ে সৃষ্টিবৈচিত্র্য তাকে বিশিষ্ট করেছে; কিন্তু নিজ মাতৃভাষা মৈথিলীতে রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা বিষয়ক যে অত্যুৎকৃষ্ট পদাবলি রচনা করেছিলেন তা-ই তাকে অমরতা দান করেছে। তার পদাবলি বাংলা আসাম উড়িষ্যা ও পূর্ববিহারে সমাদৃত। শ্রীচৈতন্যদেবের আগে তার আবির্ভাব হয়েছিল বলে বৈষ্ণবের বৈশিষ্ট্য তার মধ্যে প্রত্যক্ষ করা চলে না; তবে কবি হৃদয়ের নিবিড় আকুতি বৈষ্ণব পদাবলিতেই তিনি প্রতিফলিত করেছেন। রাজা শিবসিংহের আমলে রচিত কবিতায় যে পরিমাণে ‘বিলাস কলাকৌতূহল, নর্মলীলার উল্লাস এবং আনন্দোজ্জ্বল জীবনের প্রাচুর্য’ দেখা যায় তা পরবর্তীকালের রচনায় অনুপস্থিত।

কবি বিদ্যাপতির কাব্যে চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবতত্ত্ব প্রতিফলিত হয়নি, তিনি এই অলৌকিক প্রেমকাহিনীকে মানবিক প্রেমকাহিনী হিসেবে রূপ দিয়েছেন। নবোদ্ভিন্নযৌবনা কিশোরী রাধার বয়:সন্ধি থেকে কৃষ্ণবিরহের সুতীব্র আর্তি বর্ণনা বিদ্যাপতির কবিতায় উপজীব্য। রাধা চরিত্রের পরিকল্পনায় অপূর্ব কবিত্বের পরিচয় দিয়ে কবি কামকলায় অনভিজ্ঞা বালিকা রাধাকে শৃঙ্গার রসের পূর্ণাঙ্গ নায়িকায় রূপান্তরিত করেছেন, প্রগাঢ় প্রেমানুভূতি দেহমনকে আচ্ছন্ন করে রাধার মনে ভাবান্তর এনেছেন, কৃষ্ণবিরহের তন্ময়তায় রাধার বিশ্বভুবন বেদনার রঙে রাঙিয়ে দিয়েছেন। বিদ্যাপতির পদে শাশ্বত কালের কলাকুতূহপূর্ণা রহস্যময়ী নায়িকার নিখুঁত প্রতিচ্ছবি প্রত্যক্ষ করে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন,-

‘এই পদগুলি পড়িতে পড়িতে একটি সমীর চঞ্চল সমুদ্রের উপরিভাগ চক্ষে পড়ে। কিন্তু সমুদ্রের অন্তর্দেশে যে গভীরতা, নিস্তব্ধতা যে বিশ্ববিস্মৃত ধ্যানশীলতা আছে তা বিদ্যাপতির গীতি তরঙ্গের মধ্যে পাওয়া যায় না।’

-বিদ্যাপতি যে বিপুল সংখ্যক পদে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা রূপায়িত করেছেন, তার মধ্যে রাধার বয়:সন্ধি অভিসার, প্রেমবৈচিত্র্য ও আপেক্ষপানুরাগ, বিরহ ও ভাবসম্মিলনের পদগুলি বিশেষ উৎকর্ষপূর্ণ। মিথিলার ঐশ্বর্যপূর্ণ রাজসভায় বিদ্যাপতি অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সাথে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের ভাষা ভাব শব্দ ছন্দ ও অলঙ্কারের খনি থেকে রত্নরাজি আহরণ করে রাধার প্রেম বর্ণনা করেছেন। ছন্দ অলঙ্কারে, শব্দবিন্যাসে ও বাগবৈদগ্ধে বিদ্যাপতির পদ ‘হীরক খণ্ডের মতো আলোক বিচ্ছুরণে সহস্রমুখী’, আবার ‘জীবনের আলো ও আঁধার, বিপুল পুলক ও অশান্ত বেদনা, রূপোল্লাস ও ভাবোন্মাদনা, মিলন ও বিরহ, মাথুর ও ভাব সম্মেলনে’ তার পদ আজো অতুলনীয়।

বিদ্যাপতির পদাবলি রচনায় যে বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তা তার অসংখ্য পদে লক্ষ করা যায়। রাধার প্রেমলীলার বিচিত্র পরিচয় তার পদে বিধৃত। তার ভাব ভাষা চিত্ররূপ অলঙ্কার ও ছন্দে পরবর্তীকালের অনেক পদকর্তা বিদ্যাপতিকে অনুসরণ করেছেন।

বিদ্যাপতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তর :-

---

১) কার অনুরোধে বিদ্যাপতি কাব্যচর্চা শুরু করেন?

উঃ দেবসিংহ।

২)বিদ্যাপতি তার অধিকাংশ পদাবলী কোন রাজার রাজ সভায় থাকাকালীন রচনা করেন?

উঃ শিবসিংহ।

৩) বিদ্যাপতির মেয়ের নাম কি?

উঃ দুল্লহি/ দুলহা।

৪) বিদ্যাপতি ভারতীয় সাহিত্য ভান্ডারের কোন কোন গ্রন্থ থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন?

উঃ গাথাসপ্তশতী, অমরুশতক, শৃঙ্গারতিলক, শৃঙ্গারশতক প্রভৃতি।

৫) বিদ্যাপতির পদে উল্লিখিত মুসলমান রাজার নাম কী?

উঃ নুসরৎ শাহ।

৬) বিদ্যাপতির কোন সংস্কৃত গ্রন্থের প্রভাব আজও বর্তমান?

উঃ দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী।

৭) 'বিদ্যাপতিগোষ্ঠী' এই বইটি কার লেখা?

উঃ সুকুমার সেন।

৮) বিদ্যাপতি মিথিলার কোন রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন ?

উঃ কামেশ্বর।

৯)বিদ্যাপতি কোন্ রানীর গুনমুগ্ধ ছিলেন ?

উঃ লছিমা দেবীর ।

১০) বিদ্যাপতি কত জন রাজার পৃষ্ঠপোষকতা পান?

উঃ ৬ জন রাজা ও এক জন রানীর। মোট ৭ জনের।

১১) বিদ্যাপতির ভাষাকে বিকৃত মৈথিলী কে বলেন?

উঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১২) বিদ্যাপতিকে 'মৈথিল কোকিল' আখ্যায়িত করেন কে?

উঃ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

১৩) কার মতে বিদ্যাপতির আসল নাম 'বসন্তরায়'?

উঃ জন বীমস।

১৪) কোন পুঁথিতে বিদ্যাপতি কে 'সপ্রতিষ্ঠ সদুপাধ্যায় ঠক্কুর শ্রীবিদ্যাপতিনামাঞ্জয়া' বলা হয়েছে??

উঃ শ্রীধরের 'কাব্যপ্রকাশ বিবেক'পুঁথিতে।

১৫) "বিদ্যাপতি ভক্ত নহেন, কবি - গোবিন্দদাস যতবড় কবি, ততোধিক ভক্ত" - মন্তব্যটি কার?

উঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৬) বিদ্যাপতি কে ' পঞ্চোপাসক হিন্দু' বলে কে প্রচার করেন?

উঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

১৭) 'বিদ্যাপতি বিচার' গ্রন্থটি কার লেখা?

উঃ সতীশচন্দ্র রায়।

১৮) বিদ্যাপতি রচিত প্রথম গ্রন্থ কী ?

উঃ ভূপরিক্রমা।

১৯) 'মহাজন পদাবলী' পদসংকলনটি কার ?কে কবে প্রকাশ করেন?

উঃ বিদ্যাপতির রচনা ।জগবন্ধু ভদ্র,১৮৭৪ খ্রি: প্রকাশ করেন।

২০) 'রসিকসভাভূষন সুখকন্দ' কার উপাধি?

উঃ বিদ্যাপতি।

২১) বিদ্যাপতির জীবন নিয়ে তৈরি সিনেমাটি কত সালে অভিনীত হয়?

উঃ সিনেমার নাম 'বিদ্যাপতি', ১৯৩৭ খ্রি. তৈরি হয়। পরিচালক - দেবকী বসু। পাহাড়ী সান্যাল বিদ্যাপতি চরিত্রে অভিনয় করেন।

২২) 'বিদ্যাপতি মিথিলার কবি'— একথা কে প্রচার করেন?

উঃ জন বীমস।

২৩) "নব কবি শেখর" উপাধিটি কার?

উঃ বিদ্যাপতির।

২৪) বিদ্যাপতি তাঁর কোন গ্রন্থে নিজেকে" খেলন কবি" বলেছেন?

উঃ " কীর্তিলতা" কাব্যে।

২৫) বিদ্যাপতির পদকে" Cosmic imagination" কে বলেছেন?

উঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর "বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা" গ্রন্থে।

২৬) বিদ্যাপতিকে বাইরের কবি কে বলেছেন?

উঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।।

২৭) "বাঙ্গালী বিদ্যাপতির পাগড়ী খুলিয়া ধুতি চাদর পড়াইয়া দিয়াছে"- কে বলেছেন?

উঃ দীনেশচন্দ্র সেন।

২৮) '' বিদ্যাপতি যে মৈথিল লোকে তাহা একরুপ ভুলিয়াই গেল । বিদ্যাপতি অনেকের কাছে বাঙালি হইয়া দাঁড়াইলেন।'' - মন্তব্যটি কার?

উঃ খগেন্দ্র নাথ মিত্র।

২৯) বিদ্যাপতিকে 'অভিনব জয়দেব' কে আখ্যা দেন?

উঃ শিব সিংহ।

৩০) পদকল্পতরু - তে বিদ্যাপতির কটি পদ আছে?

উঃ ৮ টি।

৩১) বিদ্যাপতির লেখা কোন গ্রন্থে হর-পার্বতীর কথা রয়েছে?

উঃ শৈবসর্বস্বসার।

৩২) বিদ্যাপতির পদাবলীর বৃহত্তম সংস্করণ কে প্রকাশ করেন?

উঃ দীনেশচন্দ্র সেন।

৩৩) বিদ্যাপতির রচিত নাটক কোনটি?

উঃ গোরক্ষবিজয়।

৩৪) 'কীর্তি পতাকা' কার পৃষ্ঠপোষকতায় রচনা করেন?

উঃ শিব সিংহের।

৩৫) 'কীর্তিলতা' কার পৃষ্ঠপোষকতায় রচনা

করেন?

উঃ কীর্তি সিংহের।

৩৬) বিদ্যাপতির স্মৃতিশাস্ত্র মূলক রচনা কোনটি?

উঃ দূর্গাভক্তিতরঙ্গিনী।

৩৭) বিদ্যাপতির পদে গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রভাব নেই কেন?

উঃ তিনি চৈতন্য পূর্ববর্তী কবি হওয়ার দরুন এই প্রভাবের প্রশ্নই আসে না।

৩৮) লিখনাবলী গ্রন্থ কোন রাজার আমলে রচিত?

উঃ পুরাদিত্যের আমলে।

৩৯) লেখনবলীর বিষয়বস্তু কি?

উঃ এই রচনায় পত্র লেখার নিয়ম রীতি আলোচিত হয়েছে।

৪০) বিদ্যাপতিকে কোন বিদেশী কবির সাথে তুলনা করা হয়?

উঃ চসার।

৪১) বিদ্যাপতি কার আমলে রাজপন্ডিত হিসাবে নিযুক্ত হন?

উঃ কীর্তিসিংহ।

৪২) কোন গ্রন্থে বিদ্যাপতি মনসার কথা লিখেছেন?

উঃ ব্যাড়ী ভক্তিতরঙ্গিনী।

৪৩) বিদ্যাপতির পদসংকলনের নাম কী?

উঃ মহাজন পদাবলী।

৪৪) বিদ্যাপতি মোট কটি সংস্কৃত নাটক লিখেছিলেন ?

উঃ দুটি। যথা - গোরক্ষবিজয় ও মণিমঞ্জুরী।

৪৫) "বিদ্যাপতির কবিখ্যাতিকে বাঙালী পবিত্র হোমাগ্নির মতো রক্ষা করেছে"- কে বলেছেন একথা?

উঃ অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায়।

৪৬) বিদ্যাপতির পদ প্রথম কে সংগ্রহ করেন?

উঃ জর্জ গীয়ার্সন।

৪৭) বিদ্যাপতির পদের সংখ্যা কত?

উঃ প্রায় ৯০০ টির মত।

৪৮) বিদ্যাপতির আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থ কোনটি?

উঃ বিভাগসার।

৪৯) বিদ্যাপতি প্রথম কোন রাজার পৃষ্ঠপোষকতা অর্জন করেছিলেন?

উঃ ভোগীশ্বর।

৫০) বিদ্যাপতি কোন কোন ভাষায় কাব্য রচনা করেন?

উঃ সংস্কৃত, অবহট্ট, মৈথিলি ।

৫১) বিদ্যাপতি বাঙালী নন একথা কে প্রমাণ বলেন?

উঃ রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

৫২) বিদ্যাপতির রচনার প্রধান রস কী?

উঃ শৃঙ্গার রস।

৫৩) "বিদ্যাপতির কবিতা দূরগামিনী বেগবতী তরঙ্গসঙ্কুলা নদী" - এটি কার উক্তি ?

উঃ বঙ্কিমচন্দ্রের।

৫৪) "বিদ্যাপতির প্রথম অধ্যায়গুলি সমস্ত অলংকার শাস্ত্রেরঅনুযায়ী, কিন্তু মাথুর ও ভাবসম্মিলনে তিনি ভাবরাজ্যে বাঙালী বৈষ্ণব কবিদের মূলসুর ধরিয়াছেন"— মন্তব্যটি কার?

উঃ দীনেশচন্দ্র সেন।

৫৫) বিদ্যাপতির হর পার্বতী বিষয়ক পদগুলি কী নামে প্রচলিত?

উঃ মহেশবাণী।

৫৬) বিদ্যাপতির লেখা ইতিহাস গ্রন্থ কোনটি?

উঃ কীর্তিলতা' ও ' কীর্তিপতাকা' (অবহট্ট ভাষায় রচনা)।

৫৭) তিনি কোন গ্রন্থে নিজেকে 'খেলন কবি' বলেছেন?

উঃ 'কীর্তিলতা' তে।

৫৮) হরগৌরী বিষয়ক পদ রচনা করেছেন কোন ভাষায়?

উঃ মৈথিলি ভাষায়।

৫৯) '' বিদ্যাপতির পদাবলী মধুচক্রের মত, ইহার কুহরে কুহরে মাধুর্য'' - মন্তব্যটি কার?

উঃ আচার্য দীনেশ চন্দ্র সেন।

৬০) তুর্কিরাজের বর্ণনা আছে কোন গ্রন্থে?

উঃ কীর্তিলতা।

৬১) বিদ্যাপতির আত্মপরিচিতমূলক পদের উল্লেখ কোন গ্রন্থে রয়েছে?

উ: 'পদসমুদ্র' সংকলনে।

বিদ্যাপতির কিছু পদ ও তার পর্যায়

(১) নহাই উঠল তীরে রাই কমলমুখী (পূর্বরাগ)

(২) হাথক দরপণ মাথক ফুল (পূর্বরাগ)

(৩) সখি হে আজ জায়ব মোয়ী (অভিসার)

(৪) অব মথুরাপুর মাধব গেল (মাথুর)

(৫) হরি গেও মধুপুর হাম কুলবালা (মাথুর)

(৬) চির চন্দন উড়ে হার না দেলা (মাথুর)

(৭) এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর (মাথুর)

(৮) প্রেম অঙ্কুর জাত আত ভেল (মাথুর)

(৯) অঙ্কুর তপন তাপে যদি জারব (মাথুর)

(১০) পিয়া যব আয়ব এ মঝু গেহে (ভাবোল্লাস)

(১১) আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লু (ভাবোল্লাস)

(১২) কি কহব রে সখি আনন্দ ওর (ভাবোল্লাস)

(১৩) মাধব বহুত মিনতি করি তোয় (প্রার্থনা)

(১৪) তাতল সৈকত বারিবিন্দু সম (প্রার্থনা)

পদাবলীর চণ্ডীদাস (১৩৭০-১৪৩০) :

মধ্যযুগের চতুর্দশ শতকের বাঙালি কবি। তিনি চৈতন্য-পূর্ব বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলী রচয়িতা হিসেবে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। চৈতন্যদেবের জন্মের আগে থেকেই চণ্ডীদাসের নামোল্লেখিত বহু গীতিপদ মানুষের মুখে মুখে ফিরত। চৈতন্যদেব নিজে তাঁর পদ আস্বাদন করতেন। শ্রুতি আছে, রজকিনী রামী তাঁর সহজসাধনের সঙ্গিনী ছিলেন।

চণ্ডীদাস-সমস্যা :

বাংলা ভাষায় রাধা ও কৃষ্ণের প্রেম সম্পর্কিত প্রায় ১২৫০ টির অধিক কাব্যের সন্ধান পাওয়া গেছে যেখানে রচয়িতা হিসেবে বড়ু চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস ও দ্বিজ চণ্ডীদাস তিনটি ভিন্ন নামের উল্লেখ রয়েছে আবার কোনোটিতে রচয়িতার নামের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় নি। এ কাব্যগুলো ভণিতা নামে পরিচিত। ভণিতা একই ব্যক্তি কর্তৃক রচিত কিনা তা পরিষ্কার করে জানা যায় না। আধুনিক পণ্ডিতরা ধারনা করে থাকেন, বর্তমান যে সকল কবিতা চণ্ডীদাসের নামে রয়েছে তা অন্তত চারজন ভিন্ন চণ্ডীদাস কর্তৃক রচিত হয়েছে। ভণিতা কাব্যের রচনাশৈলী অনুযায়ী তাদের পৃথক করা যায়।[১]

প্রথম চণ্ডীদাস হিসেবে পদাবলীর চণ্ডীদাসকে ধারণা করা হয় যিনি আনুমানিক ১৪ শতকে বীরভূম জেলায় (বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ) জন্ম নেন; তিনি চৈতন্য-পূর্ব বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব পদাবলী রচয়িতা হিসেবে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। কারও কারও মতে, তিনিই মধ্যযুগীয় বাংলা কবিতার অন্যতম নিদর্শন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচনা করেন। তবে ড. মিহির চৌধুরী কামিল্যা ভাষাতাত্ত্বিক তথ্যপ্রমাণের সাহায্যে প্রমাণ করেছেন, ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ রচয়িতা বড়ুচণ্ডীদাস বাঁকুড়া জেলার সদর মহকুমাস্থ ছাতনার অধিবাসী ছিলেন। [২][৩] এই কাব্যে কবি নিজেকে অনন্ত বড়ু চন্ডীদাস হিসাবে ভণিতা দিয়েছেন। তাঁর আসল নাম অনন্ত, কৌলিক উপাধি বড়ু, এবং গুরুপ্রদত্ত নাম চণ্ডীদাস। তিনি বাসলী/বাশুলী

দেবীর উপাসক ছিলেন (বীরভূমের নানুরে এই দেবীর মন্দির আছে)। "বড়ু" শব্দটি "বটু" বা "বাড়ুজ্যে" (বন্দ্যোপাধ্যায়) শব্দের অপভ্রংশ বলে মনে করা হয়।

চণ্ডীদাসের মৃত্যু সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের আবিষ্কর্তা বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ স্থানীয় প্রবাদের উল্লেখ করেছেন — বীরভূমের নানুরে বাশুলীদেবীর মন্দিরের কাছে চণ্ডীদাসের কীর্তন দলের একটি নাট্যশালা ছিল। চণ্ডীদাস একবার গৌড়ের নবাবের রাজসভায় গান গাওয়ার অনুরোধ রক্ষা করতে সেখানে যান। তাঁর কণ্ঠে ভক্তি-প্রেমের গান শুনে নবাবের বেগম মুগ্ধ হয়ে যান এবং তিনি চণ্ডীদাসের গুণের অনুরাগিণী হয়ে পড়েন। বেগম একথা নবাবের কাছে স্বীকার করলে নবাব ক্রোধের বশে চণ্ডীদাসকে মৃত্যুর দণ্ডাদেশ দেন। আত্মীয় বন্ধুবর্গের সামনে চণ্ডীদাস হস্তিপৃষ্ঠে আবদ্ধ হয়ে নিদারুণ কশাঘাত সহ্য করে প্রাণবিসর্জন দেন; বেগম সেই দৃশ্য দেখে শোকে মুর্চ্ছিতা হয়ে প্রাণবিয়োগ করেন।[৪] কথিত আছে, শূদ্র কন্যা রামীর সঙ্গে তার প্রেম ছিল বলে স্থানীয় লোকজন তাকে মেরে তার বাড়িতে চাপা দিয়ে দেয়। আবার কারও মতে তিনি সেই সময়ের বৈষ্ণব পীঠস্থান ইলামবাজারে পালিয়ে গিয়েছিলেন।

দীন চণ্ডীদাস এবং দ্বিজ চণ্ডীদাস নামক ভণিতার দুইজন কবিকে চৈতন্য-পরবর্তী যুগের কবি বলে ধারণা করা হয়। তবে এই নামদুটি ভনিতার হেরফের মাত্র বলেই অনুমিত হয়।

চণ্ডীদাসের কিছু পদ ও তার পর্যায়

(১) সই কেবা শুনাইল শ্যামনাম (পূর্বরাগ)

(২) রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা (পূর্বরাগ)

(৩) ঘরের বাহিরে দণ্ডে শতবার (পূর্বরাগ)

(৪) একে কুলবতী ধনি। (পূর্বরাগ)

(৫) এমন পীড়িতি কভূ নাহি দেখি শুনি (পূর্বরাগ)

(৬) কাহারে কহিব মনের মরম (পূর্বরাগ)

(৭) এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা (অভিসার)

(৮) যত নিবারিয়ে চাই নিবার না যায় গো (আক্ষেপানুরাগ)

(৯) বঁধু, কি আর বলিব তোরে (আক্ষেপানুরাগ)

(১০) কি মোহিনী জান বঁধু (আক্ষেপানুরাগ)

(১১) তোমারে বুঝাই বঁধু তোমারে বুঝাই (আক্ষেপানুরাগ)

(১২) মন মোর আর নাহি লাগে গৃহ কাজে (আক্ষেপানুরাগ)

(১৩) কাল জল ঢালিতে সই কালা পড়ে মনে (আক্ষেপানুরাগ)

(১৪) বঁধু কি আর বলিব আমি (নিবেদন)

(১৫) বঁধু তুমি যে অ্যাম্বার প্রাণ (নিবেদন)

(১৬) ললিতার কথা শুনি হাসি হাসি বিনোদিনী (মাথুর)

(১৭) রাইয়ের দশা সখীর মুখে (মাথুর)

গোবিন্দ দাস

“আধক আধ-আধ দিঠি অঞ্চলে যব ধরি পেঁখলু কান।
কত শত কোটি কুসুমশরে জরজর রহত কি জাত পরান।।”

(গোবিন্দদাস কবিরাজ)

চৈতন্য-উত্তর বৈষ্ণব পদাবলি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি গোবিন্দদাস কবিরাজ। ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা বলা চলে একাধারে সাধক, ভক্ত ও রূপদক্ষ এই কবিকেই। যৌবনের প্রান্তসীমায় উপনীত হয়ে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন গোবিন্দদাস। অতঃপর রূপ গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণি আয়ত্ত্ব করে বৈষ্ণব রসশাস্ত্র অনুসারে রচনা করতে থাকেন রাধাকৃষ্ণ-লীলা ও চৈতন্য-লীলার পদাবলি। তাঁকে বলা হয় বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য। যদিও বিদ্যাপতির রচনার সঙ্গে তাঁর রচনার সাদৃশ্য ও বৈপরীত্য দুইই চোখে পড়ে। তাঁর একটি পদ ‘সুন্দরী রাধে আওয়ে বনি’ পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক সুরারোপিত হয়ে আধুনিক অ-বৈষ্ণব সমাজেও সমান জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

গোবিন্দদাসের জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ভক্তমাল গ্রন্থ, নরহরি চক্রবর্তীর ভক্তিরত্নাকর ও নরোত্তমবিলাস (এই গ্রন্থদ্বয়ে কবির রচিত অধুনালুপ্ত সঙ্গীতমাধব নাটকের অংশবিশেষ উদ্ধৃত) ও রামগোপাল দাসের রসকল্পবল্লী কবির সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য জানা যায়। তিনি অধুনা পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত শ্রীখণ্ডে এক বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা চিরঞ্জিত সেন ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদ। জন্মকাল সঠিক জানা না গেলেও গবেষকেরা অনুমান করেন যে তিনি ষোড়শ শতকে মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। চিরঞ্জিত সেন ভক্তকবি দামোদর সেনের কন্যা সুনন্দাকে বিবাহ করে স্বগ্রাম কুমারনগর ত্যাগ করে বৈষ্ণবতীর্থ শ্রীখণ্ডে বসবাস শুরু করেন। সুনন্দা দেবীর গর্ভেই নৈয়ায়িক রামচন্দ্র ও তাঁর ছোটো ভাই কবিরাজ গোবিন্দদাসের জন্ম। প্রথম জীবনে গোবিন্দদাস শাক্ত ছিলেন বলে জানা যায়। বৈষ্ণবধর্মে তাঁর বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না। যৌবনের শেষভাগে গ্রহণী রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মনে কৃষ্ণভক্তির উদয় হয়। তখন তাঁর দাদা রামচন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় শ্রীনিবাস আচার্য গোবিন্দদাসকে বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। গোবিন্দদাসের বয়স তখন ৪০। গদাধর প্রভুর প্রয়াণের সংবাদ পেয়ে শ্রীনিবাস আচার্য বৃন্দাবনে চলে গিয়েছিলেন। শ্রীখণ্ডের রঘুনাথ ঠাকুরের আদেশে রামচন্দ্র তাঁকে ফিরিয়ে আনতে যান। যাওয়ার আগে গোবিন্দদাসকে অধুনা মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলার কাছে তেলিয়া-বুধরী গ্রামে যেতে নির্দেশ দেন। শ্রীনিবাস আচার্য ফিরে এলে তিনি গোবিন্দদাসের কাছে কিছুকাল অবস্থান করেন। এই সময় তিনি গোবিন্দদাসের স্বমুখে তাঁর রচিত পদাবলি গান শুনতেন। এই সময়েই শ্রীনিবাস আচার্যের অনুরোধে গোবিন্দদাস গীতামৃত রচনা করেন। মুগ্ধ শ্রীনিবাস আচার্য তাঁকে ‘কবিরাজ’ উপাধিতে ভূষিত করেন। এরপর তিনি বৃন্দাবনে তীর্থে গিয়ে জীব গোস্বামী, গোপাল ভট্ট প্রমুখের সম্মুখে নিজের পদাবলি গান করেন। ফিরে এলে ভক্তগণ তাঁকে নিয়ে মহোৎসব করেন। এই সময় নরোত্তম ঠাকুরের পিতৃব্যপুত্র রাজা সন্তোষ দেবের অনুরোধে তিনি ভক্তিমূলক নাটক সঙ্গীতমাধব রচনা করেন। গোবিন্দদাসের পুত্র দিব্যসিংহও পিতার ন্যায় ভক্ত ছিলেন বলে জানা যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন বলে জানা যায়। তাঁর শেষজীবন তেলিয়া-বুধরীর পশ্চিমপাড়াতেই অতিবাহিত হয়েছিল।

গোবিন্দদাস ছিলেন সৌন্দর্যের কবি, রূপানুরাগের কবি। তিনি ভক্তি ও রূপের মধ্যে এক নিবিড় ঐক্যসাধনে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর পদগুলি ভাষা, অলংকার ও ছন্দের সৌন্দর্যে এবং ভাবের গভীরতায় পরিপূর্ণ। রূপসৌন্দর্যের ভাবপ্রতিমা সৃজনে তিনি কতদূর সক্ষম হয়েছিলেন তা পূর্বরাগের এই পদটির বর্ণনা থেকেই পরিস্ফুট হয় –

যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকময় হোতি।।

এই তীব্র রূপাসক্তিই ছিল গোবিন্দদাসের কাব্যরচনার মূল। তাঁর ভক্তি যত বেড়েছে, যতই তিনি সাধনার উচ্চস্তরে উপনীত হয়েছেন, ততই এই রূপমুগ্ধতা তাঁকে নিয়ে গেছে পূর্ণতার দিকে।

রাসাভিসারের পদে গোবিন্দদাসের জুড়ি সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্যে নেই। এই সকল পদে ছন্দে, সুরে, ভাবে ও ভাষায় যে স্বতঃস্ফুর্ত উল্লাস ঝরে পড়েছে, তা অনুধাবন করতে এই একটি পদই যথেষ্ট:

শরদ চন্দ পবন মন্দ বিপিনে ভরল কুসুমগন্ধ।
ফুল্ল মল্লিকা মালতী যূথী মত্ত মধুকর ভোরণী।।
হেরত রাতি ওছন ভাতি শ্যামমোহন মদনে মাতি।
মুরলী গান পঞ্চম তান কুলবতী-চিত-চোরণী।।

শুধু রাসাভিসারই নয়, সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকেও অভিসারের পদে গোবিন্দদাসের জুড়ি নেই। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর মতে, অভিসারের পদে গোবিন্দদাস রাজাধিরাজ। সৃষ্টির আদি মুহূর্ত থেকে বিবর্তনের পথে মানবজীবনের অগ্রগতির সঙ্গে অভিসারের ধারণাটি সম্পৃক্ত। অভিসারের অর্থ নিছক সঙ্কেতস্থানে মিলনার্থে প্রণয়ী-প্রণয়িণীর গুপ্তযাত্রা নয়, অভিসারের অর্থ কাম্যবস্তু লাভে কঠোর কৃচ্ছসাধন। জয়দেব অভিসারের কথা বলেছেন কোমল-কান্ত সুরে – 'চল সখি কুঞ্জং সতিমির পুঞ্জং শীলয় নীল নিচোলম্।' কিন্তু গোবিন্দদাসের অভিসার অনেক পরিণত। এই অভিসার সাধনার নামান্তর –

মন্দির বাহির কঠিন কপাট।
চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট।।

তঁহি অতি দূরতর বাদল দোল।
বার কি বারই নীল নিচোল।।

সুন্দরী কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস সুরধুনী পার।।

ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরম মরি জাত।।

দশ দিশ দামিনী দহই বিথার।
হেরইতে উচকই লোচনভার।।

ইথে যদি সুন্দরি তেজবি গেহ।
প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ।।

গোবিন্দদাস কহ ইথে কি বিচার।
ছুটল বাণ কিয়ে নয়নে নিবার।।

গোবিন্দদাসের রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদেও পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, মিলন, বিরহ, মাথুর প্রভৃতি পর্যায় আছে। তাঁর রাধার মধ্যেও বাসকসজ্জা, খণ্ডিতা, মান-অভিমান, কলহান্তরিতা দশা লক্ষিত হয়। বিদগ্ধ গোবিন্দদাস অন্তর-সংঘাতে বিধ্বস্ত রাধার আত্মগ্লানি, দীনতা, মিনতি পরিস্ফুট করেছেন উৎকৃষ্ট ভাব ও ভাষায়। তবে বিরহের পদে তাঁর সার্থকতা নেই। তিনি আরাধনার কবি। প্রেমের কবি। তাঁর রূপোল্লাসের প্রদীপে বিরহের অন্ধকার অপহৃত হয়েছে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ছিলেন গোবিন্দদাসের জীবনদেবতা। স্বীয় পদে তিনি এঁকেছেন দিব্যভাবচঞ্চল মহাপ্রভুর অন্তর্জীবনের ছবি –

নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে পুলক মুকুল অবলম্ব।
স্বেদমকরন্দ বিন্দু বিন্দু চূয়ত বিকশিত ভাবকদম্ব।।

গোবিন্দদাসকে বলা হয় বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য। কবি বল্লভদাস তাঁকে বলেছেন দ্বিতীয় বিদ্যাপতি। তবে বিদ্যাপতির সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য নিছকই ভাষাগত। ভাবগত নয়। বিদ্যাপতির ভাষা ব্রজবুলি। গোবিন্দদাসের ভাষাও বাংলা-অনুসারী ব্রজবুলি। এমনকি তাঁর খাঁটি বাংলা পদও দুর্লভ নয় –

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী অবনী বহিয়া যায়।
ঈষৎ হাসির তরঙ্গহিল্লোলে মদন মুরছা পায়।।

ছন্দ-অলংকারের ঝংকারে ধ্বনিমাধুর্যে গোবিন্দদাসের পদ বিদ্যাপতির সমতুল। কিন্তু বিদ্যাপতির পদে ভক্তের আকুতি অনুপস্থিত। তিনি জীবনরসিক কবি। মনে রাখতে হবে, ধর্মক্ষেত্রে বিদ্যাপতি ছিলেন শৈব। গোবিন্দদাস, অন্যদিকে, স্বয়ং বৈষ্ণবই শুধু নন, ষোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব ধর্মনেতাদের অন্তরঙ্গও বটে। চৈতন্য-প্রবর্তিত ভক্তিধর্মের অন্যতম রসভাষ্যকার গোবিন্দদাস কবিরাজ। বিদ্যাপতি সভাকবি, গোবিন্দদাস ভক্তকবি। স্বভাবতই, বিদ্যাপতির পদে আছে বুদ্ধির দীপ্তি, রাজকীয় আভিজাত্য। সেখানে ভক্তি এসেছে কদাচিত। কিন্তু গোবিন্দদাসের সব ছন্দ, সব অলংকার, সকল ধ্বনির এক এবং একমাত্র গতি হল ভক্তি। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার অন্তর্নিহিত সত্যটি যে সেই জীবাত্মা-পরমাত্মার অপার্থিব সম্পর্ক – সেই বৈষ্ণব তত্ত্বের অনুভূতিরই অন্যতম প্রকাশস্থল গোবিন্দদাসের পদাবলি। এই প্রসঙ্গে তাঁর

অভিসার পর্যায়ের পদগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে – যেখানে তাঁর প্রতিস্পর্ধী কবি বৈষ্ণব সাহিত্যে বিরল।

গোবিন্দদাসের কিছু পদ ও তার পর্যায় :

(১) ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনি (পূর্বরাগ)

(২) যাঁহা যাঁহা নিকষয়ে তনু তনু জ্যোতি (পূর্বরাগ)

(৩) সহচরী মেলি চললি বররঙ্গিনী (পূর্বরাগ)

(৪) রূপে ভরল দিঠি সোঙ্গারি পরশ বিঠি (পূর্বরাগ)

(৫) সুনয়নী কহত কানু ঘন শ্যামর (পূর্বরাগ)

(৬) আধক আধ আধ দিঠি অঞ্চলে (পূর্বরাগ)

(৭) কণ্টক গাড়ি কমলসম পদতল (অভিসার)

(৮) মন্দির বাহির কঠিন কপাট (অভিসার)

(৯) কুল মরিয়াদ কপাট উদ্ঘাটলু (অভিসার)

(১০) আদরে আগুসরী রাই হৃদয়ে ধরি (অভিসার)

(১১) মাধব কি কহব দৈব বিপাক (অভিসার)

(১২) নামহি অক্রুর ক্রুর নাহি যা সম (মাথুর)

(১৩) পিয়ার ফুলের বনে পেয়ার ভোমরা (মাথুর)

(১৪) যে মুখ নিরখনে নিমিখ না সহই (মাথুর)

(১৫) যাঁহা পহু অরুণ চরণে জাত (মাথুর)

জ্ঞানদাস :

কবি জ্ঞানদাস (শ্রীমঙ্গল, মঙ্গল ঠাকুর বা মদনমঙ্গলা নামেও পরিচিত ছিলেন) একজন মধ্যযুগীয় বাংলা কবি। তাঁর জন্ম ১৫৬০ সিউড়ী ও কাটোয়ার অন্তর্বর্তী কাঁদরা নামক গ্রামে মঙ্গলাখ্য বিপ্রবংশে। তিনি ষোল শতকের পদাবলী সাহিত্যের একজন সেরা কবি। তাঁর সুনাম চন্ডীদাস বা বিদ্যাপতির চেয়ে কোন অংশে কম নয়। তাঁর জীবন সম্বন্ধে খুব বেশি কিছু জানা জায় না। তিনি ছিলেন ভক্ত বৈষ্ণব সে জন্য তার পদে ভক্তের আবেগ বেশি পাওয়া যায়। সেকালের বটপত্রে জ্ঞানদাস সম্পর্কে সামান্য কিছু তথ্য আছে।

শ্রীচৈতন্যের জীবনী লিখেছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। তার চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে জানা যায়,জ্ঞানদাস নিত্যানন্দ শাখার একজন বৈষ্ণব। নিত্যানন্দ ছিলেন চৈতন্যের ঘনিষ্ঠ সহচর এবং বাংলার বৈষ্ণব সমাজের খুব বড় নেতা। জ্ঞানদাসের অনেক পদে নিত্যানন্দের ভক্তি ও প্রশংসা আছে। পদগুলো পড়লে মনে হয় জ্ঞানদাস নিত্যানন্দকে অনেক কাছ থেকেই দেখেছিলেন। নিত্যানন্দের মৃতুর পর তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী জাহ্নবা দেবী বৈষ্ণব সমাজের নেত্রী হয়েছিলেন। জ্ঞানদাস ছিলেন জাহ্নবা দেবীর শিষ্য। চৈতন্যের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে বৈষ্ণব গ্রন্থগুলো প্রচারের দায়িত্ব যাঁরা নিয়েছিলেন, নরোত্তম দাস (আনুমানিক ১৫৪০-১৬১০) তাঁদের মধ্যে একজন। তিনি রাজশাহী জেলার খেতুরি নামক স্থানে এক মহা উৎসবের আয়োজন করেছিলেন এবং উৎসবে বাংলাদেশের সব বৈষ্ণবকে ডেকেছিলেন। সেই মহামেলায় জ্ঞানদাসও অংশ নিয়েছিলেন বলে জানা যায়। তখন নাকি তাঁর বয়স প্রায় পঞ্চাশ বছর। জ্ঞানদাস বলরাম দাস, গোবিন্দ দাস প্রমুখ

বৈষ্ণব কবিদের সমসাময়িক হতে পারেন।

কারো মতে, তাঁর জন্ম ১৫৩০ সালে; কারো মতে ১৫২০ থেকে ১৫৩৫ সালের মধ্যে। জন্ম পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার কাঁদড়া গ্রামে। নিত্যানন্দের জন্মস্থান একচক্রা বা একচাকা গ্রামের কাছাঁকাছি এই কাঁদড়া গ্রাম। এখানে জ্ঞানসাসের একটি মঠ আছে। জ্ঞানদাসের মৃত্যু উপলক্ষে প্রতিবছর পৌষ মাসের পূর্ণিমার সময় এই জায়গায় মেলা হয়। জ্ঞানদাস অবিবাহিত ছিলেন বলে জানা যায়। অন্যমতে, তিনি বিয়ে করেছিলেন এবং তাঁর একটি পুত্র ছিল।

জ্ঞানদাস একজন উৎকৃষ্ট পদাকার ছিলেন। তাঁর কিছু স্মরনীয় পদ আছে। যেমন, রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর, কিংবা সুখের লাগিয়ে এ ঘর বান্ধিলুঁ ইত্যাদি। এই সব পদ বৈষ্ণব সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। পদাবলীর গুণ ও মান বৃদ্ধিতে জ্ঞানদাসের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। ষোল শতক পদাবলীর স্বর্ণযুগ। জ্ঞানদাস এই স্বর্ণযুগের কবি। ভক্তের অনুভূতিকে কবিতায় প্রকাশ করার অপূর্ব প্রতিভা তাঁর মধ্যে ছিল।

শব্দব্যবহার ও ভাষাভঙ্গি একই রকম বলে জ্ঞানদাসকে চন্ডীদাসের অনুসারী বলা হয়। অকৃত্রিম সহজ রচনারীতির দিক থেকে চন্ডীদাসের সঙ্গে তাঁর মিল অবশ্যই আছে। কিন্তু জ্ঞানদাস একজন সতন্ত্র কবি। আধুনিক কালের গীতিকবিতার বৈশিষ্ট তাঁর পদে পাওয়া যাবে।

জ্ঞানদাসের নামে প্রায় শ'দুয়েক পদ চালু আছে। ব্রজবুলিতেও তিনি অনেক পদ রচনা করেছেন। তবে তাঁর বাংলা পদগুলো ব্রজবুলির পদের তুলনায় অনেক ভাল। জ্ঞানদাসের একটি বিখ্যাত পদ নিম্নরূপ:

“ রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।
ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরান

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর। ”

জ্ঞানদাস সঙ্গীত বিষয়েও একজন বিশেষজ্ঞ। একালে রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল যেমন নিজেদের লেখার গানে সুর দিয়েছেন, সেকালে জ্ঞানদাসও একই কাজ করেছেন। সম্ভবত এ ক্ষেত্রে জ্ঞানদাস বাংলা সাহিত্যে প্রথম ব্যক্তি, যিনি গান লিখে সুর দিয়েছেন। কীর্তন গানেও তাঁর দক্ষতা ছিল বলা হয়। কীর্তনের নতুন ঢঙ তিনি তৈরি করেছিলেন।

জ্ঞানদাসের কিছু পদ ও তার পর্যায়

(১) রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর (পূর্বরাগ)

(২) আলো মুঞি জান না (পূর্বরাগ)

(৩) দেইখ্যা আইলাম তার (পূর্বরাগ)

(৪) তুমি কি জান সই কানুর পিরিতি (পূর্বরাগ)

(৫) পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার (পূর্বরাগ)

(৬) কানু অনুরাগে হৃদয় ভেল কাতর (অভিসার)

(৭) মেঘ যামিনী অতি ঘন আন্ধিয়ার (অভিসার)

(৮) শ্যাম অভিসারে চলু বিনোদিনী রাধা (অভিসার)

(৯) সুখের লাগিয়া এ ঘর বান্ধিনু (আক্ষেপানুরাগ)

(১০) বঁধু তোমার গরবে গরবিনী আমি (নিবেদন)

✿ **প্রশ্নোত্তরে বৈষ্ণব পদাবলী** :

⇝ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ – বৈষ্ণব পদাবলী।

⇝ এ অমর কবিতাবলী সৃষ্টি হয় – রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা অবলম্বনে।

⇝ পদাবলী সাহিত্যের আদি বাঙালি কবি কাকে ধরা হয়? >জয়দেব।

⇝ বৈষ্ণব পদাবলী বৈষ্ণব সমাজে পরিচিত – মহাজন পদাবলী নামে।

⇝ বৈষ্ণব পদাবলীর মাহকবি বলা হয় – বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম দাস।

⇝ বৈষ্ণব পদাবলির অধিকাংশ পদ রচিত – ব্রজবুলি ভাষায়।

⇝ ব্রজবুলি ভাষা হলো – একটি কৃত্রিম ভাষা।

১.বিষ্ণুর উপাসকদের বৈষ্ণব বলে।

২.অনেকগুলি পদের সমষ্টি কে বলে পদাবলী।

৩.সপ্তম শতাব্দীতে আচার্য দণ্ডী 'পদসমুচ্চয়' অর্থে তাঁর কাব্যাদর্শে পদাবলী শব্দটি ব্যবহার করেন।

৪.মহাভারতের শান্তিপর্বে বৈষ্ণব শব্দটির প্রথম উল্লেখ মেলে।

৫.বৈষ্ণব ভক্তকবিরা তাঁদের উপাস্য দেবদেবীর উদ্দেশ্যে ভক্তিমূলক যে পদগুলি রচনা করেছেন সেগুলিকেই একত্রে বৈষ্ণব পদাবলী নামে পরিচিত।

৬.বাংলা বৈষ্ণব পদাবলী বাংলা ও ব্রজবুলি এই দুই ভাষায় লেখা।

৭.ব্রজবুলি মৈথিলী, বাংলা, অবহটঠ এই তিন ভাষার সংমিশ্রনে তৈরি হয়েছে।

৮.ব্রজবুলি ভাষায় লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা কাব্যের নাম 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী '।

৯.ব্রজবুলি ভাষায় প্রথম পদ লেখেন যশোরাজ খাঁ।

১০.পদাবলী সাহিত্যের সূচনা ধরা হয় জয়দেব থেকে।

১১.রূপ গোস্বামীর লেখা বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের সর্বাধিক প্রামাণিক গ্রন্থ দুটি হল 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' এবং 'উজ্জ্বলনীলমণি'।

১২.বিদ্যাপতিকে অভিনব জয়দেব বলা হয়।

১৩.গৌরচন্দ্রিকা বিষয়ক প্রথম পদ লেখেন রাধামোহন ঠাকুর।

১৪.ষোড়শ শতককে বৈষ্ণব পদসাহিত্যের সুবর্ন যুগ বলা হয়।

১৫.বিদ্যাপতিকে মৈথিলী কোকিল বলা হয়।

১৬.গৌরচন্দ্রিকা বিষয়ক পদ প্রথম গাওয়া হয় খেতুরীর মহোৎসবে।

১৭.গোবিন্দদাস কবিরাজ অভিসার পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি।

১৮.মাথুর পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি বিদ্যাপতি।

১৯.প্রার্থনা পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি বিদ্যাপতি।

২০.পূর্বরাগের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন চণ্ডীদাস।

২১.আক্ষেপানুরাগ পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবি চণ্ডীদাস।

২২.রাধার কয়েকজন দূতীর নাম হল বায়বী,শিবদা,পৌরবী।

২৩. রাধার কয়েকজন সখী হল ললিতা,বিশাখা, চম্পকললিতা,ইন্দুলেখা, তুঙ্গবিদ্যা।

২৪.গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের পথিকৃৎ হলেন মাধবেন্দ্রপুরী।

২৫.রাধার পিতামহের নাম মহীভানু।

২৬.রাধার পিতার নাম বৃষভানু এবং মাতার নাম কীর্তিদা।

২৭.গোবিন্দদাস কবিরাজকে দ্বিতীয় বিদ্যাপতি বলা হয়।

২৮.জ্ঞানদাসকে চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য বলা হয়।

২৯.প্রাকচৈতন্য যুগের দুজন পদকর্তা হলেন বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস।

৩০.চৈতন্য উত্তর দুজন পদকর্তা হলেন জ্ঞানদাস,গোবিন্দদাস।

৩১.ষোড়শ শতকের কয়েকজন পদকর্তা হলেন নরহরি সরকার, লোচন দাস,জ্ঞানদাস,বলরাম দাস।

৩২.সপ্তদশ শতকের কয়েকজন পদকর্তা হলেন গোবিন্দদাস, নরোত্তম দাস।

৩৩.সপ্তদশ শতকের কয়েকটি বৈষ্ণব পদসংকলন হল নন্দ কিশোর দাসের 'রসপুষ্পকলিকা',পীতাম্বর দাসের 'রসমঞ্জরী', মনোহর দাসের 'দিনমণিচন্দ্রোদয়'।

৩৪.অষ্টাদশ শতকের কয়েকটি বৈষ্ণব কাব্য সংকলন হলj রাধামোহন ঠাকুরের 'পদামৃতসমুদ্র',

দীনবন্ধু দাসের 'সঙ্কীর্তনামৃত',গোকুলানন্দ সেনের'পদকল্পতরু'।

৩৫.বৈষ্ণবপদে আট রকমের নায়িকা দেখা যায়।যথা -অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, উৎকন্ঠিতা,বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, প্রোষিতভর্তৃকা, স্বাধীনভর্তৃকা।

৩৬.বৈষ্ণব সাহিত্যে আট রকমের অভিসার লক্ষ্য করা যায়,যথা-জ্যোৎস্নাভিসার,তামসাভিসার, বর্ষাভিসার,দিবাভিসার,কুজ্ঝটিকাভিসার,তীর্থযাত্রাভিসার,উন্মত্তাভিসার,অসমঞ্জভিসার।

৩৭.মধুর রসকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়-সাধারণী, সমঞ্জস্য,সমর্থা।

৩৮.কবি কর্ণপুর পূর্বরাগের দর্শনজাত অনুরাগ তিন রকম হতে পারে বলে মনে করেন।যথা-সাক্ষাৎদর্শন,চিত্রপটে দর্শন,স্বপ্নে দর্শন।

৩৯.কবি কর্ণপুর পূর্বরাগের শ্রবণজাত অনুরাগ পাঁচ রকম হতে পারে বলে মনে করেন।যথা-বন্দীমুখে শ্রবণ, দূতী মুখে শ্রবণ, সখী মুখে শ্রবণ, গুণিজন দের মুখে শ্রবণ, বংশীধ্বনি শ্রবণ।

৪০.শ্রীচৈতন্যের অন্যতম প্রধান পার্শ্বচর ছিলেন নিত্যানন্দ।

৪১.বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন বিদ্যাপতির কবিতা 'স্বর্ণহার'এবং চণ্ডীদাসের কবিতা 'রুদ্রাক্ষমালা'।

৪২.রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্যাপতিকে 'সুখের কবি' এবং চণ্ডীদাসকে 'দুঃখের কবি' বলেছেন।

৪৩.মহাপ্রভুর লীলার প্রত্যক্ষদ্রষ্টা ছিলেন বাদুদেব ঘোষ।

৪৪.জ্ঞান দাসের ভণিতায় ৪০০টি পদ পাওয়া গেছে।

৪৫.রূপ গোস্বামী তাঁর 'উজ্জ্বলনীলমণি'গ্রন্থে কৃষ্ণ প্রেমিকাদের দুটি শ্রেণিতে ভাগ করেছেন।যথা-স্বকীয়া,পরকীয়া।

৪৬.ড.সুকুমার সেন বৈষ্ণব পদাবলীর চারটি বিভাগ করেছেন, যথা-গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদাবলী, ভজন পদাবলী, রাগাত্মিকা পদাবলী, রাধাকৃষ্ণ পদাবলী।

৪৭.গৌড়ীয় বৈষ্ণবগন শ্রীরাধাকে কৃষ্ণের 'হ্লাদিনী শক্তি' বলে অভিহিত করেছেন।

৪৮.বৈষ্ণব সাহিত্যে পঞ্চরস হল-শান্ত,দাস্য,সখ্য,বাৎসল্য, মধুর।

৪৯.বলরাম দাস হলেন বাৎসল্য রসের শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব পদকর্তা।

৫০.পদাবলীর চণ্ডীদাস 'চণ্ডীদাস' ছাড়াও 'দ্বিজচণ্ডীদাস' ভণিতায় পদ লিখেছেন।

৫১.বিদ্যাপতি অনেক পদে 'কবিরঞ্জন' ভণিতা ব্যবহার করেছেন।

৫২]শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনকাল বলুন। >১৪৮৬-১৫৩৩খ্রিঃ।

৫৩]বাংলাদেশে প্রাপ্ত প্রাচীনতম ব্রজবুলী পদকার কে? >যশোরাজ খাঁ।

৫৪]দু’জন চৈতন্য সমসাময়িক পদকারের নাম করুন। >ক.মুরারি গুপ্ত ।খ.শিবানন্দ সেন ।..

৫৫]গৌরচন্দ্রিকার জনক কে? >নরহরি সরকার ।

৫৬]সপ্তদশ শতকের দু’জন পদকারের নাম করুন। >ক.সৈয়দ মর্তুজা।খ.নসির মামুদ।..

৫৭]ঘোষ ভাতৃত্রয় কারা? >ক.গোবিন্দ ঘোষ খ.মাধব ঘোষ গ.বাসু ঘোষ ।

৫৮]চারজন ব্রজবুলি পদকারের নাম করুন। >ক.বিদ্যাপতি খ.গোবিন্দদাস গ.বলরাম দাস ঘ.জ্ঞানদাস।।..

৫৯]বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্তর্গত শাখা গুলির নাম করুন। >ক.চৈতন্যজীবনী সাহিত্য খ.পদাবলী সাহিত্য গ.বৈষ্ণব তত্ত্ব সাহিত্য।

৬০]বৈষ্ণব পদাবলীতে মুখ্য রস কয়টি? >পাঁচটি। শ্রেষ্ঠ কোনটি? >শৃঙ্গার বা মধুর।

৬১]কি মোহিনী জান বঁধু কি মোহিনী জান;কার কোন পর্যায়ের পদ? >চণ্ডীদাসের।আক্ষেপানুরাগ পর্যায়ের।

৬২]সংগীত মাধব কার লেখা গ্রন্থ? >গোবিন্দদাসের।

৬৩]দ্বিতীয় বিদ্যাপতি কার আখ্যা? >গোবিন্দদাস। কে দিয়েছেন? >বল্লভ দাস।

৬৪]চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য কে? >জ্ঞানদাস।তিনি কার শিষ্যত্ব নেন? >জাহ্নবা দেবীর।

৬৫]বাৎসল্য রসের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা কে? >বলরাম দাস।

৬৬]দুইটি পদাবলী সংকলন গ্রন্থের নাম করুন। >ক্ষণদাগীতচিন্তামণি ও পদকল্পতরু।

৬৭]আদি পদাবলী সংকলন ও শ্রেষ্ঠ পদাবলী সংকলনের নাম করুন।

>যথাক্রমে,ক্ষণদাগীতচিন্তামণি ও পদকল্পতরু।

৬৮]যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল;কার পঙক্তি? >জ্ঞানদাসের।

৬৯]নীরদ নয়নে নীর ঘন সিঞ্চনে;কার কোন পর্যায়ের পদ?

>গোবিন্দদাসের।গৌরাঙ্গ-বিষয়ক।

৭০]অভিসার;গৌরাঙ্গ বিষয়ক পদ;রূপানুরাগ এই পর্যায়গুলির শ্রেষ্ঠ কবি কারা?

>যথাক্রমে,গোবিন্দদাস,গোবিন্দদাস,জ্ঞানদাস।

তথ্যসূত্র :ইন্টারনেট